১০.২২ জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম
Peace-Keeping Operation of the UN

ভূমিকা : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান কাজ হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। শান্তি বিঘ্নকারী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে অথবা শান্তিবিঘ্নকারী কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে তা দূর করতে জাতিপুঞ্জকে সকলপ্রকার যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সনদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে। শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে জাতিপুঞ্জ বিবদমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা বলপ্রয়োগমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারে। আজ পর্যন্ত দু'বার জাতিপুঞ্জের নামে যৌথ সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে— প্রথমবার পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ায় এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯০-৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে উদ্ভূত সংকটে। শান্তিভঙ্গের অন্যসব ঘটনায় জাতিপুঞ্জ যে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করে এসেছে, তাকে বলা হয় **শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম** (Peace-Keeping Operation)।

সংজ্ঞা : টম্পকিন্‌স (E B Tompkins) তাঁর *'The UN in Perspective'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বিশ্বজোড়া বিপর্যয় এড়াবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে উপায়ে কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহকে সংকট থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করে, তাকে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যপদ্ধতি বলে ("Peace-keeping is

put forward as a means by which the UN may be used to help states stay out of trouble or back away from trouble, in an era when inter-state trouble can easily mean universal catastrophe.")। **রোসালিন হিগিনস** (R Higgins)-এর মতে, জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম বলতে সেই ধরনের কার্যাবলিকে বোঝায় যেসব ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জের প্রতি নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সামরিক বা আধা-সামরিক কাজে নিযুক্ত থাকেন, শান্তিরক্ষার জন্য জাতিপুঞ্জের নির্দেশিত নীতি পালন করেন এবং কেবল আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র বহন করেন। জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল, "আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত এবং নির্দেশিত তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বা কোনো একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের প্রতিরোধ, সংকোচন, তীব্রতা হ্রাস বা অবসান।" শান্তি সংস্থাপনের কাজে সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করা হয় ঠিকই, কিন্তু তা করা হয় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, অথবা কোনো শক্তি বা শক্তিগোষ্ঠীর প্রাধান্য বিস্তারের স্বার্থে নয়। বরং যুদ্ধ বা সংঘর্ষকে মিটিয়ে ফেলা বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখাই এর উদ্দেশ্য। শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘর্ষের অবসান ঘটানো।

জাতিপুঞ্জের প্রাক্তন মহাসচিব **বুত্রোস ঘালি** (Boutros Ghali)-র মতে, শান্তিরক্ষা হল এক ধরনের কৌশল যা বিরোধ প্রতিরোধের এবং শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করে ("Peace-keeping is a technique that expands the possibilities of both the prevention of conflict and the making of peace.")। **ম্যারাক্ গৌলডিং** (Marrack Goulding)-এর মতে, আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন আন্তর্জাতিক বা জাতীয় বিরোধের নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অকুস্থলে যেসব কার্য সম্পাদন করে, সেগুলিকে বলে জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম। সংক্ষেপে বলা যায়, **আন্তর্জাতিক অথবা জাতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতি নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যেসব কাজকর্ম সম্পাদন করে সেগুলিই এর শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম।**

শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও পদ্ধতি :

শান্তিরক্ষামূলক কার্যপদ্ধতি হল জাতিপুঞ্জের যৌথ নিরাপত্তামূলক কার্যকলাপের একটি বিকল্প ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয় না। উপদ্রুত এলাকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উত্তেজনা হ্রাসের চেষ্টা করা, পরস্পরবিরোধী সৈন্যবাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে সংঘর্ষ রোধের উদ্দেশ্য একটি বাফার (buffer) হিসাবে কাজ করা, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহারে সাহায্য করা, গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিরোধ মিটিয়ে নিতে সাহায্য করা ইত্যাদি শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে এক জনৈক গবেষক মন্তব্য করেছেন, "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে দেখা যায় সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে যুদ্ধের জন্য নয়, অথবা কোনো পক্ষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, অথবা কোনো দেশ বা শক্তি জোটের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; বরং বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা মিটিয়ে দিতে।"— (Sukhbir Singh, *Structure and Functions of the UN*)।

জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয় জাতিপুঞ্জ এবং বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে। চুক্তি হয় এই মর্মে যে, উপদ্রুত এলাকায় জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাবাহিনীর প্রবেশ বিবদমান পক্ষগুলি মেনে নেবে। **এটা একটা সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা**; একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চালু থাকে। অবশ্য নবীকরণের মাধ্যমে এই ধরনের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কার্যক্রমটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তিনটি শর্তপূরণ আবশ্যক, যথা—

(১) এই কাজে অগ্রসর হতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সম্মতি গ্রহণ আবশ্যক।

(২) জাতিপুঞ্জের এই ধরনের কাজের পিছনে আন্তর্জাতিক মহলের ব্যাপক সমর্থন দরকার।

(৩) শান্তিরক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষক ও সৈন্যসরবরাহের জন্যে জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করতে হবে।

সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া :

জাতিপুঞ্জের সনদে শান্তিরক্ষামূলক কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা নেই। স্বাভাবিকভাবেই, শান্তিরক্ষাকারী মিশন বা বাহিনীর গঠন, তত্ত্বাবধান ও তার ব্যয়ভার বহনের ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ, সাধারণসভা ও মহাসচিবের দায়িত্ব ও ভূমিকা কী হবে, কতটা হবে তা নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, কখনও নিরাপত্তা পরিষদ, কখনও সাধারণসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পর্যবেক্ষক দল বা শান্তিবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মধ্যপ্রাচ্য, সাইপ্রাস প্রভৃতি স্থানে শান্তিরক্ষাবাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং গ্রিসের উত্তরাংশে শান্তিরক্ষা মিশন প্রেরণ করা হয় সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। অন্যান্য সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদকেই সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে। তবে সিদ্ধান্ত যেখান থেকেই আসুক, গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে মহাসচিবকেই প্রধান দায়িত্ব নিতে হয়।

শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রম **দুধরনের** হতে পারে—

(১) নিরস্ত্র পর্যবেক্ষণকারী মিশন (Observer Mission) এবং

(২) হালকা অস্ত্রে সজ্জিত শান্তিরক্ষাবাহিনী। তবে এই শ্রেণিবিভাগ কঠোরভাবে মানা হয় না। কখনও কখনও পর্যবেক্ষণকারী মিশনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে পদাতিক বাহিনী থাকে; আবার সশস্ত্র শান্তিরক্ষাবাহিনীর সঙ্গে অসামরিক পরিদর্শকও থাকেন।

শান্তিরক্ষা বাহিনীর গঠন ও প্রকৃতি :

জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাবাহিনী খুবই হালকা ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে এবং আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা ওই অস্ত্র প্রয়োগ করে না। **জাতিপুঞ্জের কোনো স্থায়ী সৈন্যবাহিনী নেই**। মহাসচিবের অনুরোধক্রমে সদস্যরাষ্ট্রগুলি যেসব সৈন্য পাঠায় তাদের নিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাবাহিনী একজন **ফোর্স কমান্ডার** (Force Commander)-এর অধীনে থাকে। বিভিন্ন দেশের সামরিক কর্মীদের নিয়ে শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠিত হয় ঠিকই, কিন্তু এইসব কর্মী যখন জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন, তখন তাঁদের জাতীয় পরিচিতি থাকে না, তাঁরা আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের পুরোপুরি জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীনে কাজ করতে হয়। জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাবাহিনীর সঙ্গে একটি অসামরিক বিভাগও যুক্ত থাকে। জাতিপুঞ্জের সচিবালয় থেকে বাছাই করা কিছু আধিকারিক ও কর্মী এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হন। এছাড়া যোগাযোগ ও পরিসেবার জন্য স্থানীয় কিছু লোকজনকেও অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়।

জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক উদ্যোগের কয়েকটি উদাহরণ :

জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রথম প্রয়োগ ঘটে ১৯৪৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বাণিজ্য দূতাবাস (Consular Commission) স্থাপন এবং বলকান অঞ্চলের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে। তারপর আরব-ইজরায়েল সংঘাত থামানোর উদ্দেশ্যে ১৮৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ সংস্থা (UNTSO)গঠন করা হয়। এরপর জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে যেসব পর্যবেক্ষণ সংস্থা গঠন ও প্রেরণ করা হয়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ভারত-পাকিস্তান সংঘাত প্রশমনে ১৯৪৯ সালে গঠিত সামরিক পর্যবেক্ষণ গোষ্ঠী (UNMOGIP, 1949), লেবাননে (UNOGIL,1958), ইয়েমেন-এ (UNYOM, 1963), পুনরায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শেষে (UNIMOP, 1965), ডমিনিকান রিপাবলিক-এ (DOMREP, 1965), আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে (UNGOMAP, 1988) , ইরান-ইরাক যুদ্ধশেষে (UNIMOG, 1988) এবং অ্যাঙ্গোলায় (UNAVEM, 1989)।

জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে **সশস্ত্র শান্তিরক্ষাবাহিনী** প্রেরণ করা হয় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঃ সুয়েজ সংকটের মোকাবিলায় ১৯৫৬ সালে যে বাহিনী গঠন করা হয় সেটি হল UNEF এবং এটি ক্রিয়াশীল ছিল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। তারপর কঙ্গো সংকট (১৯৬০-৬৯) নিরসনে প্রেরিত হয় ONUC । এরপর ১৯৬২ সালে পশ্চিম ইরিয়ানে প্রেরণ করা হয় UNSF । ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে এর কাজ শেষ হয়ে যায়। তারপর আবার মধ্যপ্রাচ্যের জন্য গঠন করা হয় UNEF-II । এটি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এরপর ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার উদ্দেশ্যে যে বাহিনী গঠন করা হয় সেটি হল UNTAG । এটিও এক বছরের মাথায় কাজ শেষ করে ফেলে।